International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 78-88
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i5.2020.78-88

বাংলা পত্রসাহিত্য ও মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract:

In English, what is called an 'Epistle' is referred to as 'Patrokabyo' in Bengali. 'Epistle' is a Greek word meaning 'message.' The 'Epistle' has no connection with literary epistolary poetry. Later, Martin Gray provided a new definition based on which it gained a place in literary circles. According to Martin Gray, in post-Renaissance European literature, Horace first created this type of poetic model around 20 B.C.

While studying at Bishop's College, Michael Madhusudan Dutta acquired substantial knowledge of both English and Italian languages. Due to his keen interest in foreign languages, he gained proficiency in both. It was during his time at this college that he became acquainted with the Roman poet Ovid's "The Heroides or Epistle of the Heroines." While reading this poetry, he envisioned various characters from Eastern mythological stories and planned to create a novel poetry collection similar to Ovid's work. Ovid's poetry contained a total of 21 letters. Following that pattern, he also considered including 21 letters in his 'Birangona Kabyo' (Poetry of the Heroines). However, he completed only 11 letters, with the remaining ones left unfinished.

In these eleven letters of 'Birangona Kabyo' the heroines' distinct thoughts are evident. He has depicted these heroines, drawn from mythological stories, in a new form by blending modernity with traditional tales.

Keywords: Birangona Kabyo, Epistle, Patrokabyo, Michael Madhusudan Dutta.

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Epistle', বাংলায় তাকেই বলা হয় পত্রকাব্য। 'Epistle' একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ সংবাদ। Encyclopedia Britanica-য় 'Epistle' এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

> "Epistle, in its original sense a word meaning simply a letter, has come to be used only of formal letters written in ancient times, or of an elaborate kind of literary production, akin to the ode and the elegy, which, while addressed to a particular person, is concerned with public rather than personal affairs or expresses a universal feeling on a particular occasion. The epistle is written

> for an audience, with a conscious artistry and elaboration of style, to develop an argument or theme"[১]

এই সংজ্ঞানুযায়ী 'Epistle' এর সঙ্গে সাহিত্যিক পত্রকাব্যের কোনো মিল নেই। পরবর্তীকালে মার্টিন গ্রে এর একটি নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেন যার উপর ভিত্তি করে এটি সাহিত্যিক মহলে স্থান করে নেয়। মার্টিন গ্রে এর সংজ্ঞানুযায়ী 'Epistle' হল:

> 'A letter especially one of the apostolic letters in the New Testament. The word is also used of poems or moral or semi philosophical themes addressed to a friend or patron, in the manner of an informal, well-argued letter.'

গ্রে এর মত অনুযায়ী রেনেসাঁস পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সাহিত্যে খ্রীঃপূঃ ২০ অব্দে হোরেস সর্বপ্রথম এধরনের কবিতার আদর্শ নির্মাণ করেছিলেন।

মধুসূদন বিশপ কলেজে পড়ার সময় ইংরেজি এবং ইতালীয় ভাষায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বিদেশি ভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ থাকার জন্য দুটি ভাষায়ই তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই কলেজে পড়ার সময়ই তিনি রোমক কবি ওভিদের 'The Heroides or Epistle of the Heroines' কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। এই কাব্যটি পাঠ কালেই তাঁর মাথায় প্রাচ্যের পৌরাণিক কাহিনির নানা চরিত্রের কথা মনে আসে এই কাব্যের সাথে মিলিয়ে একটি অভিনব কাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন।

ওভিদের কাব্যে মোট ২১টি পত্র ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনিও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ২১টি পত্র সংযোজনের কথা ভাবেন। কিন্তু তিনি ১১টি সম্পূর্ণ পত্র রচনা করেন, বাকীগুলি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র এই ১১টি পত্রে নায়িকার স্বতন্ত্র্য ভাবনার পরিচয় রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি থেকে তুলে এনে এসব নায়িকাদের আধুনিকতার মেলবন্ধনে নতুন রূপে অঙ্কন করেছেন। ফলে প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব ভাবনায় একক ও স্বাবলীল হয়ে উঠেছে।

বীরাঙ্গনার পত্রগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল:

১. ওভিদের কাব্যের আদর্শে তিনি নায়িকাদের অঙ্কন করলেও প্রতিটি নায়িকা তাদের নিজস্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
২. গল্পরস এবং নাটকীয়তা প্রতিটি পত্রে ফুটে উঠেছে।
৩. ওডের রচনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।
৪. পৌরাণিক নায়িকারা আধুনিক জীবন দর্শনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাদের ভাবনার বিকাশ ঘটেছে।
৫. নায়িকাদের মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত পত্রের বিভিন্ন চরণে ধরা পড়েছে।
৬. আবেগ সমৃদ্ধ ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে এবং লেখক একক কথনের উপর জোড় দিয়েছেন।
৭. ওভিদের কাব্যে মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত যেমন বড় হয়ে উঠেছে তেমনি মধুসূদনের কাব্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১টি সম্পূর্ণ পত্র হল:

প্রথম সর্গ: দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দ্বিতীয় সর্গ: সোমের প্রতি তারা, তৃতীয় সর্গ: দ্বারাকানাথের প্রতি রুক্মিণী, চতুর্থ সর্গ: দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, পঞ্চম সর্গ: লক্ষণের প্রতি শূপর্ণখা, ষষ্ঠ সর্গ: অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, সপ্তম সর্গ: দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, অষ্টম সর্গ: জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, নবম সর্গ: শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, দশম সর্গ: পুরুরবার প্রতি ঊর্বশী, একাদশ সর্গ: নীলধ্বজের প্রতি জনা।

অসম্পূর্ণ পত্র:

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষী, নলের প্রতি দময়ন্তী।

মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ বহুকাল পূর্ব থেকেই একজন আরেকজনকে পত্র লিখে আসছে। সেই পত্রগুলি প্রয়োজনের কিংবা অপ্রয়োজনের তা একান্ত ব্যক্তিগত। এই সমস্ত পত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় Letter। কিন্তু ব্যক্তিগত পত্র ছাড়াও আরেক ধরনের পত্র লেখা হয় যার মধ্যে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ থাকে, এগুলিকে ইংরেজিতে বলে Epistle। সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ এই পত্রগুলিই পরবর্তীকালে পরিচিত লাভ করে পত্র্যকাব্য নামে। 'Letter' এবং 'Epistles' এর পার্থক্য বোঝাতে নিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে।

> 'A broad distinction exists between the letter and Epistles. The letter is essentially a spontaneous, non–literary production, personal and private, a substitute for spoken conversation. The Epistles on the other hand rather takes the place of a public speech, it is written with an audience in a view, it is literary from, a distinctly artistic effort aiming at performance.'

'গানভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "একাকী গায়কের নয় তো গান, গাইতে হবে দুইজনে"[২]। সে কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছিন্নপত্রের ১২৬ সংখ্যক পত্রে লিখেছিলেন- "কারো কারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, যে অন্যের ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টেনে নিতে পারে। সে তার নিজের গুণে। যদি কোন লেখকের সবচেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি লেখবার ক্ষমতা আছে।"[৩] অর্থাৎ যিনি পাঠক তার ও একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে পত্রলেখকের প্রতি। আমরা একটি মানুষের সাথে কথা বলে তার মনের অর্ধেকটা জানতে পারি যদি তার অন্তরের গোপন কক্ষে প্রবেশ করতে হয় তাহলে তার লেখনীর সাহায্য নিতেই হবে। পত্র যেখানে সাহিত্য হয়ে ওঠে সেটিই পত্র সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম স্বীকৃত উপন্যাস স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' পত্রের আকারে লেখা হয়েছিল। পত্রকাব্য পত্র সাহিত্যের অন্তর্গত। সাধারণত দুধরণের পত্রকাব্য লেখা হয়ে থাকে। একধরণের পত্রকাব্যে নীতিকথা প্রচার করা হয় এবং আরেক ধরনের পত্রকাব্যে রোমান্টিক অনুভূতি মূলত প্রাধান্য লাভ করে।

পত্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

১) সাধারণত পত্রকাব্য পত্রের আকারে লেখা হয়।

২) পত্রকাব্যের বিষয় যেমন নীতিকথা হতে পারে তেমনি লোককথা, পুরাণকথা, রোমান্টিক আখ্যানকে কেন্দ্র করে পত্রকাব্য রচিত হতে পারে।

৩) পত্রকাব্যের উদ্ভব পাশ্চাত্য সাহিত্যে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যযুগে যে সমস্ত পত্রকাব্য রচিত হয়েছে সেগুলিতে ওভেডিয়ান পদ্ধতি প্রাধান্য পেয়েছে। এই পত্রকাব্যগুলির মূল কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে প্রেম ও রোমান্টিকতা। যেমন- 'Epistle a Bascom' (1543), 'Letter from Octavia to Marcus Antoniou's' (1603) ইত্যাদি। পরবর্তিকালে যে সমস্ত পত্রকাব্য রচিত হয়েছে সেগুলিতে হোরাসিয়ান পদ্ধতি গুরুত্ব লাভ করেছে। এই শ্রেণির পত্রকাব্যগুলি হল 'An Epistle to Dr. Arbuthnot' (1735), অডেনের 'New year letter' প্রভৃতি।

৪) পত্রকাব্যে যতটুকু সম্ভব বিষয়বস্তুকে বাস্তবানুতা করে করে গড়ে তোলা হয়। সময় এবং কালের একটি বিশেষ প্রভাব পত্রকাব্যগুলিতে থাকে।

৫) নায়িকার পত্রগুলি যাতে বিশ্বাস যোগ্য হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি রাখতে হয়।

বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য হিসাবে কতদূর সার্থক:

বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্য শব্দটি ব্যবহার শুরু হয় পাশ্চাত্যের Epistle এর অনুসরণে। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পত্রকাব্য রচনা করলেও সার্থক পত্রকাব্য রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুধু যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে পত্র লেখার ধারাটি প্রচলন ছিল তা নয়। আমরা দেখি সাহিত্যে ও অনেক নায়িকা নায়কের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছেন। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর লিখেছেন- 'যে প্রাচীন ভারতে নারীগণের প্রেম প্রকাশের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতি ছিল, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, প্রেমপূর্ণ দৃষতি, মৃদুভাষা, দূতী প্রেরণ এবং পত্র পেরণ। ভাগবতে আছে রুক্মিণী দেবীর পিতা শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে মনস্থ করলে রুক্মিণী এক ব্রাহ্মণের হাতে কৃষ্ণের কাছে পত্রপ্রেরণ করে তাঁকে রক্ষা ও বিবাহ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 'শকুন্তলায়' 'বিক্রোমোবর্শীতে' বানভট্টের 'কাদম্বরীতে'তে পত্র প্রেরণের বিষয়টি লক্ষিত হয়।'

মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতিটি পত্রের কাহিনি ভারতীয় পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রতিটি পত্রই আলাদা। কাহিনি তিনি ভারতীয় পুরাণ থেকে নিলেও রচনার রীতিতে ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যকে অনুসরণ করেছেন। ওভিদের কাব্যে অর্থাৎ 'The Heroides or Epistle of the Heroines' এ নায়িকাদের হৃদয়ের কথা রোমান্টিক আবদ্ধে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রীক পুরাণের এই নায়িকাদের কর্তা মধুসূদনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৬১ সালে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্র মধুসূদন লিখেছিলেন-

> "গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'বীরাঙ্গনা' নামে একটি বস্তু কলমের আঁচড়ে খাড়া করিয়াছি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নারীরা তাঁহাদের প্রণয়ী অথবা পতিদের নিকট উপযুক্ত লিপি লিখিতেছে- ইহাই 'বীরাঙ্গনা' । এর শুদ্ধ একুশটা পত্র হইবার কথা; আমি এগারোটি সম্পূর্ণ করিয়াছি।"[৪]

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'সোমের প্রতি প্রতি তারা', 'লক্ষণের প্রতি শূপর্ণখা', এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' এই তিনটি পত্রই সার্থক পত্রকাব্য হয়ে উঠেছে। তিনটি পত্র কাব্যেই নায়িকার মনের কথা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রে মধুসূদন তারার অন্তর্দ্বন্দ্বতে বিচিত্র অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ব্রহ্মপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ' 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' এবং 'মৎস্য পুরাণে' তারার প্রসঙ্গ থাকলে কোথাও তারার পত্র লেখার প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। মধুসূদন কাহিনিকে শুধুমাত্র পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং তারার হৃদয় কথাকে বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে আধুনিক নারীতে পরিণত করেছেন। সোমদেব তারার স্বামী

বৃহস্পতির শিষ্য। তিনি সেদিন গুরুগৃহে শিক্ষা নিতে আসেন সেই প্রথমদিন দেখেই তারা তার প্রেমে পরেছেন। তারা জানেন তিনি গুরুমা। শিষ্যের প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকানো কখনো উচিৎ নয়। তাছাড়া সমাজ ও এ ধরণের সম্পর্ক মেনে নেবে না। তাই তারার মনে দেখা দিয়েছে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। একদিকে পাপবোধ আর অন্যদিকে সোমদেবের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে না নিতে পারার কষ্ট তারাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। তারার স্বামী থাকলেও তাঁর কাছ থেকে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা কোন কিছুই পাননি। যা তারাকে সোমের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তারা অনেক চেষ্টা করেছেন সোমদেবের কাছ থেকে দূরে থাকতে কিন্তু তা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তিনি সোমকে তাঁর মনের কথা জানিয়ে পত্র লিখেছেন এবং তার চরণে দাসী হয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। এই পত্রে তারার মানবিক দ্বন্দ্ব বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে।

'লক্ষণের প্রতি শূপর্ণখা' পত্রের কাহিনি তিনি রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। শূপর্ণখা রাবণের বোন, এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। এই চরিত্রটিকেই মধুসূদন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অঙ্কন করেছেন। শূপর্ণখার স্বামী রাবণের সাথে যুদ্ধে মারা গেলে রাবণ পঞ্চবটী বনে বিহার করার জন্য সুদৃশ্য কুঞ্জ বানিয়ে দেন। একদিন সেই বনে ভ্রমণকালে শূপর্ণখা রামচন্দ্রকে দেখতে পায়। সুদর্শন যুবক রামচন্দকে দেখে সে দূরে থাকতে পারেনি। কামবাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সে রামকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। রাম মজার ছলে তখন তাকে লক্ষণের কাছে যেতে বলেন। লক্ষণের কাছে গিয়ে মনের কথা ব্যক্ত করলে লক্ষণ তাকে রামের দ্বিতীয় বউ হওয়ার প্রস্তাব দেন। শূপর্ণখা ফিরে এসে সীতার রূপের নিন্দা শুরু করলে লক্ষণ প্রতিশোধ নিতে শূপর্ণখার নাক কেটে দেন। পৌরাণিক এই কাহিনিতে মধুসূদন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই পত্রে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমত তিনি শূপর্ণখাকে মানবী করে তুলেছেন এবং দ্বিতীয়ত এই পত্রে কোথাও তার নাক কাটার প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। নারীর সহজাত মনের যে প্রেম তাই এই পত্রে বিকাশ লাভ করেছে। শূপর্ণখা লক্ষণকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছে এবং তাকে তার প্রেমিক হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে। লক্ষণকে দেখে তার মনের যে বিচিত্র অবস্থা এবং তাকে পাওয়ার যে আকূল আগ্রহ তা এই পত্রে স্থান পেয়েছে।

লক্ষণ সুদর্শন যুবক হওয়া সত্ত্বেও একাকী এই বনে ছাই ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে তার মনে কৌতূহল জন্ম নেয়। এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য তিনি একাকী বনে ভ্রমণ করছেন। তিনি কি কোন নারীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন না কোন শত্রুর ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে আছেন তা তার জানতে ইচ্ছা করে। লক্ষণ মাটিতে শয়ন করছেন জেনে তিনিও সোনার পালঙে ঘুমানো ছেড়ে দিয়েছেন। যখন জানতে পেরেছেন লক্ষণ শুধুমাত্র ফলমূল খেয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন তখন তিনি ওসব রাজভোগ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি পত্রে লিখেছেন যে তার রূপ গুণ যৌবন সব আছে। যদি লক্ষণ কোন নারীর কাছে আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি তার ভালোবাসা দিয়ে তার কষ্ট দূর করে দেবেন। আবার যখন তার মনে হয়েছে যদি তিনি কোন শত্রু ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন তাহলে তিনি তার সব ক্ষমতা দিয়ে তাকে সাহায্য করলেন। তার কোন কিছুর অভাব নেই। তার ভাই রাবণের পরাক্রমে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কাঁপে। ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য, সৈন্য-সামন্ত কোন কিছুরই অভাব তার নেই, লক্ষণ শুধু একবার মুখ খুলে বললে তিনি সব তার চরণে এনে সমর্পণ করবেন। সবকিছুর বিনিময়ে তিনি শুধু তার জীবনে লক্ষণকে চান। প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার যে এই আকুলতা তা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধার মনের বাসনা এবং শূপর্ণখা লক্ষণের সাথে মিলনের যে আগ্রহ তা একাত্ম বলে মনে হয়। লক্ষণকে দেখেই তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে-

"কে তুমি, বিজন বনে ভ্রম হে, একাকী
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ?"[৫]

পত্রের শেষে এই জানার আকুলতাই তীব্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে লক্ষণের প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তার মনের গোপন কথাকে পত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে তিনি গাছের নীচে লুকিয়ে রেখে এসেছেন। সে গাছের নীচে প্রতিদিন লক্ষণ পায়চারি করেন। পত্র রেখে তিনি লুকিয়ে লক্ষণকে দেখে অঝোরে কেঁদে চলেছেন এবং মনে মনে বিশ্বাস করছেন একদিন হয়তো তার পত্র তিনি পড়বেন। তার মনের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে শেষ পংক্তিতে-

"আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।"[৬]

সমগ্র পত্রে শূর্পণখার মনের গোপন ইচ্ছা রোমান্টিক সুরে প্রকাশ করেছেন মধুকবি। পুরাণ থেকে এই চরিত্রটিকে তুলে এনে সম্পূর্ণ মানবী করে তুলেছেন তিনি। মানুষের মনের সহজাত যে ইচ্ছা, যে প্রেম ভালোবাসা মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন তাই তিনি শূর্পণখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই এই পত্রটি সংযোগের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রে জনার মাতৃহৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। জনা চরিত্রটিও পৌরাণিক চরিত্র। মধুসূদন কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে জনা চরিত্রটি সংগ্রহ করেছেন। জৈমিনি ভারতে রাজা নীলধ্বজের স্ত্রীর নাম ছিল জ্বালা। লিপিকর প্রথাকে সেই জ্বালাই কালীদাসী মহাভারতে জনা হয়ে গেছে। মধুসূদন জ্বালা নামটি না নিয়ে জনাই নিয়েছেন। মূলপত্রে কোথাও জনা তার স্বামী নীলধ্বজকে পত্র লেখেননি। তিনি স্বামী নীলধ্বজকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পুত্র প্রবীরের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু জামাতা অগ্নিদেবের পরামর্শে রাজা নীলধ্বজ পুত্রহত্যাকারী অর্জুনের প্রতি যুদ্ধ না করে তাকে বরণ করে রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং উৎসবের আয়োজন করেন। জনা এটি মেনে নিতে না পেরে ভাই উলুকের কাছে যান। ভাই উলুক ও অর্জুনের বিরুদ্ধে যেতে চাননি, তখন জনা ভাগীরথীতে আত্মবিসর্জন দেন।

পৌরাণিক এই কাহিনিকে মধুসূদন এক নতুন আঙ্গিকে এই পত্রে তুলে ধরেছেন। জনা পত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জনা তার স্বামীর কাছ থেকে চিরবিদায় নেওয়ার জন্যই এই পত্রটি রচনা করেছেন। কারণ তার ভেতরে জ্বলছে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র আগুন। যে আগুনে দ্বগ্ধ হয়ে তিনি বারংবার নীলধ্বজকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাজা তার কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি দুঃখে প্রতিবাদ স্বরূপ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেড়িয়ে যান। যাওয়ার আগে তিনি নীলধ্বজকে সবিস্তরে তার মনের কথাকে পত্রাকারে লিখে যান। এটি একটি অসাধারণ পত্র। এই পত্রে জনার মাতৃ হৃদয়ের আকুলতা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। কোন মা-ই তার পুত্র হত্যাকারীকে আপন করে নিতে পারে না। সেখানে বিনা দোষে পুত্রকে কেউ বধ করেন। অর্জুন তার স্বামীর কাছে আরাধ্য হলেও তিনি তাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। জনার এই বাস্তবিক ভাবনা, তারা মান-অভিমান, প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা তাকে মানবিক চরিত্রের রূপদান করেছে।

মহিষ্মতি পুরের রাজা নীলধ্বজ ও জনার ছিল সুখের সংসার। প্রবীর ছিল তাদের সংসারের মধ্যমণি। কিন্তু এই সুখের সংসার হঠাৎ করে ধ্বংস হয়ে যায় যখন প্রবীর পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে বন্দী করে। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোরা সব রাজ্য পরিভ্রমণ করে এসে যখন মহিষ্মতী পুরে প্রবেশ করে তখন প্রবীর তাকে ধরে বেঁধে রাখে। রাজা নীলধ্বজ ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে ও সে তার কাজে

অনড় থাকে। তা নিয়ে অর্জুনের সাথে তার যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে সে অর্জুনের সাথে পরাস্ত হলে অর্জুন তাকে বধ করেন।

অর্জুন অন্যায়ভাবে কৃষ্ণের ছলনার সাহায্যে প্রবীরকে হত্যা করেছিলেন। পুত্র মারা গেছে রাজ্যে শোকে পালন হওয়ার কথা কিন্তু জনা লক্ষ্য করেন চারদিকে উৎসবের আয়োজন চলছে। তিনি খবর নিয়ে জানতে পারেন অর্জুনকে বরণ করার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রাজাকে তার নপুংসক মনে হয়েছে। ক্ষত্রিয়তেজ যেন তার চলে গেছে। পুত্র হত্যাকারীর প্রতি যুদ্ধ না করে তাকে বরণ করার মধ্যে এক কাপুরুষোচিত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। জনা বলেছেন তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের মাজেই তোমাকে সাজে-

"এই তো সাজে তোমারে, ক্ষেত্রমণি তুমি,
মহাবাহ ! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!"[৭]

তিনি স্বামীকে অর্জুনের বংশ পরিচয়ের কথা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে অর্জুন দেবতা নন। অর্জুনের মা কুন্তী এবং স্ত্রী দ্রৌপদী স্বৈরিণী নারী। অর্জুন ও ছলনার আশ্রয়ে বার বার যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তাকে বরণ না করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়াই উচিৎ। রাজা পুত্রশোক ভুলে গেলে ও তিনি কোনভাবেই ভুলতে পারছেন না। তার বিরুদ্ধে প্রতিমুর্হূতে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। অবশেষে নিজেকে স্বামীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে ঘর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটাই হবে স্বামীর চরম শাস্তি। কারণ ঘরে এসে জনাকে না পেয়ে স্বামী যখন ভেঙ্গে পড়বেন তখন তিনি তার মর্যাদা বুঝতে পারবেন। সমগ্র পত্রে ফুটে উঠেছে জনার মনের এই প্রতিবাদী রূপ। পৌরাণিক চরিত্র জনা হয়ে উঠেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা সম্পন্ন নারী।

সোমদেব ও তারা দুটি পৌরাণিক চরিত্র। ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈর্তপুরাণ, ও মৎস্যপুরাণে এই সোম ও তারার প্রসঙ্গ রয়েছে। সোমদেব ছিলেন তারার স্বামী বৃহস্পতির শিষ্য। বৃহস্পতির কাছে শিক্ষালাভের জন্যই তিনি গুরুগৃহে এসেছিলেন। সেই হিসাবে তারা গুরুমাতা এবং সোমদেব তার সন্তান তুল্য। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনিতে দেখা যায় এই দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যা সমাজের চোখে নিন্দনীয় ছিল তাকে কেন্দ্র করেই মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে এক অসাধারণ পত্র রচনা করেছেন।

'সোমের প্রতি তারা' বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় পত্র, এই পত্রের সঙ্গে ওভিদের 'Heroides' সংখ্যক পত্রের যথেষ্ট মিল লক্ষ করা যায়। তারা যেমন যৌবনবতী হয়েও বয়স্ক স্বামীর সাথে ঘর করতে হয়েছে তেমনি ওভিদের Phaedra-3 বয়স্ক স্বামীর ঘর করেছে। দুজনের মনেই রয়েছে অচরিতার্থ প্রেম। দুজনের জীবনেই স্বামী সুখ ছিল না। তারা যেমন সোমদেবকে পত্রকে লিখছেন-

"কার আমি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।"[৮]

কিংবা,

"এ নব যৌবন, বিধু অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধু পদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি।"[৯]

একই রকম কথা শুনা যায় Phaedra এর কণ্ঠে ও। Phaedra তার সতীনের পুত্রকে তার স্নেহ ভালোবাসা অর্পন করতে চায়। সে বলেছে-'No blame will you receive, but praise instead Safe at my side and even in my bed.'
দুটি পত্রেই অসামাজিক প্রেমের কথা রয়েছে।

শূপর্ণখা চরিত্রের উৎস হল বাল্মীকির রামায়ণ। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে তার পিতা মুনি বিশ্বশ্রবা এবং মাতা রাক্ষসী কৈকসী। তার তিন ভাই রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ, কালকেয় বংশীয় রাক্ষসরাজ বিদ্যুৎ জিহ্বের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রাবণ যখন দিগ্বিজয় যাত্রা করেন তখন বিদ্যুৎজিহ্বের মৃত্যু হয়। তাই রাবণ বোনের খুশির জন্য দণ্ডকারণ্য বনে তাকে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেন। সেখানে রাম, লক্ষণ এবং সীতা চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস কাটাতে আসেন। বনের মধ্যে ভ্রমণের সময় সে প্রথম রামকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাম তাকে লক্ষণের কাছে পাঠালে লক্ষণ কৌতুক করে তাকে আবার রামচন্দ্রের কাছে পাঠায় এবং রামের দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার কথা বলে। শূপর্ণখা তখন সীতাকে তার বাঁধা মনে করে ক্রুদ্ধ হয়ে খেতে চাইলে লক্ষণ খড়গাঘাতে তার নাক কেটে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে রাবণ সীতাকে হরণ করেন এবং রাম রাবণের যুদ্ধ হয়।

'লক্ষণের প্রতি শূপর্ণখা' 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পঞ্চতম পত্র। তিনি শূপর্ণখা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এক অসাধারণ পত্র রচনা করেছেন। রাক্ষসী শূপর্ণখা কে তিনি মানবীরূপে অঙ্কন করেছেন। উক্তপত্রে শূপর্ণখা লক্ষণের প্রতি প্রেমে পড়ে তার মনের কথাকে পত্রাকারে লিখেছেন।

এই পত্রের সঙ্গে ওভিদের 'Heroides' এর সপ্তম পত্রের বিষয়ের সঙ্গে মিল রয়েছে। সেখানে 'Sichaus' এর বিধবা স্ত্রী Dido বিদেশী রাজপুত্র Aeneas এর প্রেমে পড়েন এবং তাকে প্রেমপত্র লেখেন। এই পত্রে Dido এর মনের গভীর প্রেমানুভূতি ধরা পড়েছে। মধুসূদনের শূপর্ণখার পত্রেও এই গভীর প্রেমানুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

মধুসূদন এই পত্রের কাহিনি সংগ্রহ করেছেন কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে জৈমিনি ভারতে নীলধ্বজের পত্নীর নাম ছিল জ্বালা। নীলধ্বজ মহিষ্মতী পুরের রাজা ছিলেন। তাদের একমাত্র পুত্রের নাম প্রবীর। লিপিকরের ভুলে কাশীদাসী মহাভারতে জ্বালা পরিবর্তিত হয়ে গেছে জনাতে। মধুসূদন ও জনা নামকেই তার পত্রে গ্রহণ করেছেন। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করে মহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করলে প্রবীর ঘোড়াটিকে বেঁধে রাখেন। পিতা নীলধ্বজ প্রবীরকে ঘোড়াটি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেও প্রবীর তা মানতে রাজী হননি। অবশেষে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সাথে প্রবীরের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণের ছলনার সাহায্যে অর্জুন প্রবীরকে পরাস্ত করেন এবং হত্যা করেন। প্রবীরের মৃত্যুর পর জনা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাজা নীলধ্বজকে অনুরোধ করেন, কিন্তু নীলধ্বজ জামাতা অগ্নিদেবের পরামর্শে যুদ্ধের বদলে অর্জুনকে বরণ করতে চলে যান। এতে জনা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভাই উলুকের কাছে যান। উলুক ও জনাকে সাহায্য করতে রাজী না হলে তিনি তখন প্রবল অভিমানে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' বীরাঙ্গনা' কাব্যের একদশতম পত্র। তিনি মহাভারতের জনা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এই পত্রকাব্যটি রচনা করেছেন। এই পত্রকাব্যে অভিমানী জনা তার স্বামী নীলধ্বজের উদ্দেশ্যে পত্র

লিখেছেন। জনা পুত্র প্রবীরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য স্বামী নীলধ্বজকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নীলধ্বজ তার কথা কর্ণপাত না করে পুত্রহত্যাকারী অর্জুনকেই সসম্মানে রাজ্যে নিয়ে এসে উৎসবের আয়োজন করেছেন। জনা স্বামীর এই ব্যবহার মেনে নিতে পারেননি। কারণ বিনা দোষে ছলনার আশ্রয় নিয়ে অর্জুন তার পুত্র প্রবীরকে হত্যা করেছেন। পুত্রশোকের চেয়ে ও তার বুকের মধ্যে জ্বলেছে প্রতিশোধের আগুন। সেই প্রতিশোধ নিতে না পেরে অভিমানে রাজ্যসুখ ছেড়ে তিনি চলে যান। যাওয়ার আগে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই পত্রটি রচনা করেন। উক্ত পত্রে জনার মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন ফুটে উঠেছে।

জনা চরিত্রটিকে আমরা জৈমিনী ভারত, কাশীদাসী মহাভারত এবং ব্যাসদেবের মহাভারতে খুঁজে পাই। জৈমিনী ভারতে জনার নাম জ্বালা। মহিষ্মতী পুরীর রাজা নীলধ্বজের স্ত্রী জ্বালা। গঙ্গার কৃপায় তিনি প্রবীরকে পেয়েছিলেন। জৈমিনী ভারতের আখ্যানে আছে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মহিষ্মতীপুরে প্রবেশের কারণে প্রবীর তাকে আটকে রাখেন। রাজা নীলধ্বজ পুত্রকে ঘোড়াটি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন কিন্তু প্রবীর তাতে রাজী হয়নি। ফলস্বরূপ অর্জুনের সাথে প্রবীরের যুদ্ধ হয়। অর্জুন কৃষ্ণের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধে প্রবীরকে পরাজিত করেন ও হত্যা করেন। জামাতা অগ্নির কথা অনুযায়ী পরে রাজা নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু জনা এই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি নানাভাবে স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু রাজা নীলধ্বজ জনার কোন কথাই কর্ণপাত করেননি। তখন জনা নিজেই যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান এবং শেষে গঙ্গাতে ঝাপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন।

কাশীরাম দাস যে মহাভারত রচনা করেছেন সেখানেও জনার নাম জ্বালা রয়েছে। কাহিনিও মোটামোটি এক। কাশীদাসী মহাভারতে রয়েছে স্ত্রী মদনমঞ্জুরীর ইচ্ছায় প্রবীর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে আটকান। পরবর্তীতে যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হয়। কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে রয়েছে জনা স্বামী নীলধ্বজকে বারংবার প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বললেও স্বামী তাতে কর্ণপাত না করায় তিনি তার ভাই উলুককে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু ভাই উলুক ও তাকে সাহায্য করেনি। তখন তিনি মনের দুঃখে গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন।

ব্যাসদেবের যে মহাভারত পাওয়া যায় তাতে মহিষ্মতীপুরের রাজার নাম নীলধ্বজ এবং তার জামাতা অগ্নিদেব। ব্যাসদেবের মহাভারত, জৈমিনী ভারত এবং কালীদাসী মহাভারতের এই কাহিনিকে মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আলোকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে অংকন করেছেন। তিনি কাহিনিকে ভারতীয় পুরাণ থেকে গ্রহণ করলেও রচনা করেছেন পাশ্চাত্য রীতিতে। তিনি মহাভারতের এই পৌরাণিক কাহিনিকে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। নারীর কণ্ঠ, যন্ত্রণা তিনি জনা চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। জনাকে তিনি বীরাঙ্গনারূপে অংকন করেছেন। পুত্র হত্যাকারী অর্জুনকে জনা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি যথাসাধ্য তার প্রতিবাদ করেছেন। একজন মা হয়ে পুত্রের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি যা করতে পারেন তার সব চেষ্টাই করেছেন। জনা যথার্থ অর্থেই বীরাঙ্গনা। পৌরাণিক এই নারীকে তুলে এনে মধুসূদন জনাকে আধুনিক নারীরূপে অংকন করেছেন।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রটি বীরাঙ্গনা কাব্যের একাদশতম একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র। এই পত্রের কাহিনি মধুসূদন জৈমিনী ভারত ও কালীদাসী মহাভারতের কাহিনী থেকে নিয়েছেন। জৈমিনী ভারতে মহিষ্মতীপুরের

রাজা নীলধ্বজের স্ত্রীর নাম ছিল জ্বালা। কাশীদাসী তার মহাভারতে জনা লিখেছেন। মধুসূদন ও এই পত্রে জনা নামটিকেই গ্রহণ করেছেন। রাজা নীলধ্বজ ও জনার ছিল সুখের সংসার। সংসারে কোনো ধরনের অশান্তি ছিল না। পুত্র প্রবীর ছিল তাদের মধ্যমনি। কিন্তু সবই যেন হঠাৎ করে বদলে গেল। পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করলে প্রবীর তাকে বেঁধে রাখেন। পিতা নীলধ্বজ ঘোড়াকে ছেড়ে দিতে বললেও প্রবীর তাতে রাজী হননি। তখন অর্জুনের সাথে প্রবীরের যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

প্রবীরের এই আকস্মিক মৃত্যু জনাকে উন্মাদিনী করে তুলেছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে জনা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছেন। তার ভেতরে তখন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। রাজা নীলধ্বজ যদি যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করেন তখনই তার মনের জ্বালা মিটবে। তাই তিনি বারবার অনুরোধ করেছেন নীলধ্বজ কে তিনি যেন পুত্রশোকের প্রতিশোধের জন্য অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু রাজা নীলধ্বজ জামাতা অগ্নিদেবের কথায় অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি উৎসবে যেতে উঠেছেন। জনা তা দেখে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, কি করে পুত্রহন্তারকের সাথে রাজা উৎসবে মেতে উঠেতে পারেন। প্রবীরের মৃত্যুশোক অপেক্ষা মৃত্যুর প্রতিশোধ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তাই তিনি স্বামীকে বলেছেন শোক করে কি হবে, যথার্থ ক্ষত্রিয় হিসাবে তার প্রমাণ দিতে হবে। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

> "কি কাজ বিলাপে প্রভু? পাল, মহীপাল,
> ক্ষাত্র ধর্ম্ম, ক্ষত্র ধর্ম্ম সাধ ভুজবলে।"[১০]

কিন্তু কোনভাবেই স্বামীকে তিনি অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে রাজী করাতে পারেননি। স্বামী রাজী না হওয়ায় তিনি ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে পড়েছেন। নিজেই প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভেবেছেন। তিনি তখন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। যে স্বামীকে তিনি ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন তার কাছ থেকে তিনি কখনো অপমানিত হতে চাননি। তিনি অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে চাননি। দাসী হয়ে বেঁচে থাকতে তার কাছে কোন গৌরব নেই। তাই তিনি গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এই বিরহের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চান। তাই তিনি বলেছেন-

> "চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
> ক্ষত্র-কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল বধূ;
> কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?"[১১]

তিনি লোকমুখে শুনেছেন রাজা নীলধ্বজ অর্জুনের পূজার আয়োজন করেছেন। পাণ্ডব বংশের সব ইতিহাস জানা সত্বে ও তিনি কী করে অর্জুনের সাথে মিত্রতা করতে পারেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। অর্জুন কুন্তীর পুত্র এবং তিনি একজন স্বৈরিনী নারী। যে উদ্বপায়ণ ঋষি পাণ্ডবদের সর্বক্ষণ গুণগান করেন তার মাতা সত্যবতী ও ধীবর কন্যা ও পিতা ব্রাহ্মণ। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শে তিনি সব কাজ করেন। এহেন অর্জুনকে তার স্বামী কি করে মিত্র ভাবতে পারেন। তাই তার শোক ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হয়েছে। তিনি কোনভাবেই তার পুত্র হত্যাকারীর সঙ্গে আপোশ করতে রাজী নন। পুত্র শোকে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। তাই এই চোখের জল মুছে দেওয়ার মতো কেউ আজ পাশে নেই। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন নতুন বন্ধুকে তিনি যে সুখে থাকেন। তিনি এই রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। মৃত্যুই একমাত্র তার মনকে শান্ত করতে পারে। তাই তিনি দূর থেকে

স্বামীকে প্রণাম জানিয়ে রাজপ্রসাদ ছেড়ে বেড়িয়ে পরেন। উৎসব এলে অন্তঃপুরে এসে রাজা তাকে আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। এভাবেই প্রথম থেকেই শেষ পর্যন্ত চরিত্রটির মধ্যে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য বলিষ্ঠতা। অন্যায়কে তিনি কোনভাবেই মেনে মেননি। তার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছেন। শোকে জ্বালা নিবারণ করতে না পেরে তিনি শেষে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

মধুসূদন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলে ও ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি যেমন ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি প্রাচ্যের পৌরাণিক পরিমণ্ডল ও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। মধুসূদন একটি পত্রে লিখেছিলেন 'I love the grand mythology of our ancestors it is full of poetry. A fellow with inventive head can manufacture the most beautiful things out of it'। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য এবং পুরাণের প্রতি ছিল মধুসূদনের গভীর শ্রদ্ধা। ভারতীয় পুরাণের সাথে গ্রীক পুরাণের মিলনে কবির এক নতুন ধরণের কাব্য লেখার গভীর ইচ্ছা ছিল। মধুসূদন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন- 'It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own' 'বীরাঙ্গনা' প্রতিটি পত্রে কবি কাহিনি সংগ্রহ করেছেন ভারতীয় পুরাণ থেকে। ভারতীয় পুরাণ কাহিনি ও গ্রীক পুরাণের মাধুরী মিশিয়ে ওভিদের Hero ides এর অনুসরণে তিনি এক নতুন ধরনের কাব্য রচনা করেন।

তথ্যসূত্র:

১। Encyclopedia Britanica, Volume.8 (1768) p 651
২। রবীন্দ্র-রচনাসমগ্র, কবিতা, কাহিনী, গানভঙ্গ, পৃষ্ঠা: ৩ Retrieve from https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/10504
৩। চট্টোপাধ্যায় হীরের, ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা: ৭২
৪। মিশ্র অশোককুমার, মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ৩৭
৫। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩৫
৬। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩৯
৭। তদেব, পৃষ্ঠা: ২১১
৮। তদেব, পৃষ্ঠা: ৯৩
৯। তদেব, পৃষ্ঠা: ৯৫
১০। তদেব, পৃষ্ঠা: ২০৯
১১। তদেব, পৃষ্ঠা: ২১১